KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No : KLMLGK 2007 | Place of Publication : ৩৩/২ এ. [illegible] ([illegible]), কল-১৬ ([illegible]) ([illegible]) এ-২৩, ([illegible]), [illegible], কল-৫৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher আবদুস সাত্তার |
| Title | Size 8.5"/5.5" |
| Vol & Number 4/1-2<br>5/1<br>18/2 | Year of Publication : Aug - Nov 1984<br>Aug 1985<br>(99) Dec - Feb 2000 |
| | Condition : Brittle Good |
| Editor আবদুস সাত্তার | Remarks |

| |
|---|
| CD Roll No KLMLGK |

# অ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

**চতুর্থ বর্ষ : প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা**

আগষ্ট/নভেম্বর ১৯৮৪

কবিতা

●

নাটক

●

প্রবন্ধ

●

গল্প

এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন :—

তরুন মুখোপাধ্যায়, চিত্রা চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মজুমদার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ মৈত্র, তাপস তলাপাত্র, হীরক সেনগুপ্ত এবং অরুণ ভট্টাচার্য

**সম্পাদনা : শতরূপা সান্যাল**

## আমাদের বিশ্বাস

নাটক, মানে শিল্প, মানে সংস্কৃতি, মানে জীবন, টগবগে ফুটে ওঠা জলজ্যান্ত অফুরন্ত জীবন। শিল্প মানে সংস্কৃতি মানে অবিরাম শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিকশিত রূপান্তরিত চেতনাস্রোতের দ্বন্দ্বময় রূপ, এক প্রবল মহত্তম দ্বিখণ্ডিত জাগরণ। তার অর্দ্ধেক চলাফেরা করে মঞ্চের ওপর সাজানো গল্পে বাকী অর্দ্ধেক আগুনের হুঙ্কার মত খেলে বেড়ায় হাল্কা অন্ধকারে সারি সারি চেয়ারে বসে থাকা হাজার হাজার চিন্তিত মাথা আর তোলপাড় করা বুকের ভিতর।

গণকৃষ্টি

কলকাতা

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

# কবিতা

## আমার শিশুর জন্যে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

(একগুচ্ছ কবিতা)

( ১ )

অনেক ঘুরেছি, আর নয় ;
এবার বিশ্রাম।
এইবার ঘরে ফেরা।

ঘরে যেখানে আমার সন্তান
অপেক্ষায় ক্লান্ত,
তার চোখভরা জল, মুখে ঘাম—
আমাকে ওর কাছে যেতে দাও
এখনই
ওর মুখের ঘাম, চোখের জল
আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে ;
ও এখন খুব ছোটো.
এখনই ঘাম ও অশ্রুর অভিজ্ঞতা
ওকে চেনাতে চাই না ;
আর তাই
আমার ঘরে ফেরা ভীষণ জরুরী,
বড় প্রয়োজন শিশুটিকে আদর করার !

( ২ )

আমার শিশুর জন্যে আমি রেখে যাব না
জমি কিংবা বাড়ি
রেখে যাব না ব্যাঙ্কে সুরক্ষিত টাকাও ;
বরং তার হাতে দিয়ে যাব
আমার ভাঙা বিশ্বাস, ছেঁড়া স্বপ্ন বিক্ষত হৃদয়--
এবং বলে যাব খোকা
নিজের চোখ দিয়ে তুই পৃথিবীকে দ্যাখ ; আর
নিজেকে চেনার জন্যে
কোনো আয়নার সামনে দাঁড়াবার আগে
নিজের পুরুষ-দু'হাত তাকিয়ে দেখিস !

( ৩ )

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'—
এমন প্রার্থনা আমি
কখনো করি নি।
তার চে' বরং
আমি চাই
আমার সন্তান যেন তার দুটি সমর্থ হাতে
বালি খুঁড়ে জল, আর মাটি ছেনে শস্য তোলে ;
যেন রক্ত আর ঘামের প্রতিভায়
জেনে নেয় জীবনের নিজস্ব মানে।

( ৪ )

একটি কথাও তোর বুঝতে পারি না। তবু
তোরই সঙ্গে সারাদিন আমার যত কথা
কিছুতে ফুরোয় না।
সহর্ষ বিস্ময়ে দেখি তোর হাত নাড়া, গ্রীবাভঙ্গি



দেখি তোর দোপাটি ফুলের মতো ঠোঁটে কত
কথার মৌমাছি ওড়ে ;
চিবুকে ছড়ানো হাসির ফেনার দাগ
শত মুখচুম্বনেও কখনো মোছে না।

চারিদিকে ছিন্ন পুতুল, ভাঙা শিশি, টিনের কৌটো
এই তোর খেয়ালী হাতে গড়া অপূর্ব রাজত্ব ;
আর তুই রাজেশ্বর, আমার মুকুটহীন রাজা !
কাজলমাখানো দুই আভাময় চোখে যখন তাকাস
চেয়ে চেয়ে আমার দু'চোখের আশা কখনো মেটেনা ॥

( ৫ )

মাথার উপরে সুনীল আকাশ, রোদে ঝলমল চারিধার
বড় হও তুমি প্রিয় আত্মজ হে আমার !
বয় উত্তর আর দক্ষিণ হাওয়া কাঁপিয়ে তরাই বন, পাহাড়
থেকো নিরাপদে প্রিয় আত্মজ হে আমার !
শুকনো পাতারা ঝরে গিয়ে ফের জাগে সবুজের কী বাহার
হও সুন্দর প্রিয় আত্মজ হে আমার ॥

## 'হৃদপিণ্ডে বৃষ্টির শব্দ'

### চিত্রা চট্টোপাধ্যায়

শান্ত নদীর মত চুপচাপ
টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ
হৃৎপিণ্ডের কাছে,
অনেক কালো মেঘের
চাঙড় ভেঙে
বৃষ্টি হয়ে বেরিয়েছে তো
হালকা হয়ে ঝরবে।
মুখ ঢাকা বুক চাপা
অন্ধকার শুধু
বৃষ্টির বন্যতাকে ডেকেছি
কবিতা লিখে
আমারই আত্মার ভালোবাসা
রঙ রূপ দিয়ে বানিয়েছি
হৃদপিণ্ডের খুব কাছে
তীব্র মত্ত এক গভীর
কাব্যের বৃষ্টি ধারা,
সব অন্ধকার মিশে যায়
হাজার হত্যায়
অজ্ঞাত-আত্মায়
নিশ্চিন্ত নির্বাণে
যেন তামসী মায়ের
নির্জন করুণ যোনির
নরম উষ্ণতা,
'হৃদপিণ্ডর অতিকাছে॥



## বোধি / ছয়

### শুভেন্দু মজুমদার

পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে
নদী নামে বরফ গলিয়ে
আগুন পুড়িয়ে মোম মাটি।
অহল্যা থেকো না আর—
দোহাই তোমার!
জল হও, মাটি হও
শিকড়ে বিদ্ধ কর মাটি।
তুমি তো জানোই
শিকড়ে মাটি থাকে খাঁটি।

## হে সময়, মনে রেখো

### অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে দেখা হলে
শ্রীলতা হঠাৎ উচ্ছল হয়ে
আমাকে আদরে অস্থির করেছিল।
হে সময়,
তুমি সবই কেড়ে নাও ; কেবল সঞ্চয় করো মধুর স্মৃতি
আপন ভাণ্ডারে।
শুধু মনে রেখো, আমি ক্লান্ত, বিষণ্ণ, ক্ষীণস্বাস্থ্যসম্বল
বিত্তহীন—এ-সবই হতে পারি ;
বলতে পারো, আমার যৌবন অবসিত প্রায় ;
শ্রীলতার অজস্র আদরে ধন্য হয়েছি তবু,
আমার এই ঐশ্বর্য্যের হিসাব রেখো তুমি॥

# নাটক

## চুপ ! কথা শোন—রূপকথা শোন

### প্রদীপ মৈত্র

[ সিংহাসনে রাজা বসে। দুচার সভাসদ ইতঃস্ততঃ বসে। বিশাল এক কাগজের লম্বা ফালি নিয়ে মন্ত্রী কি যেন পড়ে শোনাচ্ছেন রাজাকে। রাজা মাথা নেড়ে নেড়ে দুলে হেসে গোঁফে তা দিয়ে সম্মতি জানাবার ভঙ্গী করছেন ]

অচিনপুরের নাম জানো তোমরা ? জানোনা। তবে শোনো।

গ্রন্থিক কণ্ঠ : পাহাড়ে নদীতে ঝর্ণায়,
ফুলে ফলে পাখীর গানে—
সবুজ বনে ঘন মেঘছায়
সোনা রূপোয় নাচে গানে
ভরপুর / দেশটার নাম অচিনপুর।

ভূগোলের ম্যাপে কোথায় দেশটা তা বলতে পারবনা। তোমরা গল্পোটা মন দিয়ে শোনো। সবই নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবে। তা অচিনপুরে মহা ধুম। রাজা বজ্রাগ্নি সিংহদমনের একমাত্র মেয়ে, সোনার চাঁদ পানা সুন্দরী কুমারী কুমুদহাসিনীঅনন্ত প্রভার বিয়ের সব ঠিকঠাক। আজ থেকে দেশ জুড়ে খানা পিনা নাচ গান উৎসব। ঢালাও আয়োজন। বিয়ের আর মাত্র কুড়িদিন বাকী। সভায় ব্যস্ত রাজা মন্ত্রীর কাছ থেকে নিমন্ত্রিতদের লিষ্টিটা শুনছেন। বেশ খুশী খুশী ভাব। এমন সময়—

রাজা লাফিয়ে উঠে হাঁক পাড়লেন : মন্ত্রী !



মন্ত্রী হঠাৎ ধমকানিতে চমকানি সামলাতে পারলেন না। কাগজটা হাত ফসকে গেল। সেলাম ঠুকে বললেন :

আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : বলতে খুব খারাপ লাগছে আজ।
তুমিও কি ষড়যন্ত্রী ?
গর্দান নেবো তবে—

মন্ত্রী : [শশব্যস্তে] একি কঠিন কথা শুনি
ওরে বাবা ও মহারাজ দোহাই
কি অপরাধ কিছুই তো না জানি—
গর্দান গেলে বাকীটা কি রবে ?

রাজা : আমার নাম বজ্রাগ্নি সিংহদমন—
যদিও নিজে এখনও অবধি বক মেরেছি
কয়েক ডজন
তবু মনে রেখো আমি বংশ সূত্রে—
সিংহদমন ! !

সভার সকলে :
বিলক্ষন ! বিলক্ষন ! !

রাজা : সবই তোমরা জানো যখন—
ন্যাকার মতন কে করেছে এই লিষ্টি রচন !

মন্ত্রী : [কাঁপছে] আজ্ঞে এই অধম !

রাজা : একেবারে নরাধম !
পাজী বদমাশ বুদ্ধুবেদম !

মন্ত্রী : আজ্ঞে মানছি সবই / করছি সবই হজম—
সামাল দিই অপরাধটা ! কি করেছি দয়া করে যদি কন—

রাজা : বলছি ! সবুর করো—শিরদাঁড়াটা করছে বেজায় কন্‌কন্ !
দারোয়ান পেশীতরঙ্গ বজ্রবাহু ! টিপেদে পিঠটা—
(দারোয়ান পিঠ টেপে। রাজা চোখ বুজে আয়েস করেন।
তারপর বলেন)

দেড়শো পুরুষ আগে মহারাজ হিরণ্যকশিপু—
চিনিস তাঁকে ? তাঁর মামা শ্বশুরের জামাই
একবার খুব ফ্যাচাঙে পড়ে যে দর্জীকে দিয়ে
জরীর জামাটা করিয়েছিলেন রিপু
তিনি সিংহদমনের প্রথম সিঙ্গি !
তাঁর বংশের মেয়ের বিয়েতে বেজাত কুজাত
পেতে চলেছে নেমন্তন্ন !
ব্যাটা মন্ত্রী ! বুদ্ধিটা তোর এত জঘন্য !

মন্ত্রী : দোহাই ধর্মাবতার —ঢালাও নাচ গান খানা পিনার ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে
বলেছিলেন দরজা থাকবে খোলা—
হোকসে যেমন কামার কুমোর জোলা—

রাজা : ওটা বলতে হয় ! নইলে আবার পাঁচকান !
পড়ে যায় দেশান্তরে ! নিন্দুকদের সামলাও
তার চে সবকো বোলাও, নজরানা নিয়ে দরজা
থেকেই ভাগাও। আর হ্যাঁ ! আসছে সাতুই বিয়ে —
পনের দিন বাদ দিয়ে আগেই দরজা বন্ধ করবে—
যাদের সঙ্গে সোনার চিঠি তাদেরই কেবল ঢোকাবে—
তার আগে দিন পনেরো / ছোটলোকগুলোকে
দুআনা করে পয়সা দিও।
মেয়ের বিয়েতে মনে রাখো ! রাজবংশ উচ্চ অংশ
ছাড়া আসবে না কেউ—

মন্ত্রী : বুঝেছি এবারে—কাদের কাদের বাদ দেব ?

রাজা : গায়ের চামড়া কালো—হিহি করে হাসে, গলাগলি মেশে,
কেউ মরে গেলে কাঁদে, লাঙল ধরে ধান ফলায়, নৌকো চালায়,
গান গায়, গাছতলাতে বাঁশী বাজায়, শাক দিয়ে খায় ভাত –
গতরের ঘাম ঝরিয়ে তবে ! নিজের থাকুক না থাকুক সেই
গরাস, ঘরে কেউ এলে তাকে তুলে দেয় হাসতে হাসতে !
যারা বোকার মতন ঘেন্না করেনা ভালোবাসতে
স্বার্থছাড়া অর্থছাড়া—এই সমস্ত লক্ষ্মীছাড়া –



লিখেছ ? আবার লেখ—
নদীর ওপারে ওই যে ওরা – বোকার মত গায়ের জোরে—
লোক লসকর হাতী সেপাই এসব ছাড়াই বাঘ মারে—
ওই পুবের নদীর ঈশান কোনে ! ওইযে যারা তাঁত বোনে—
এদিকে বনের ধারে পাহাড় তলায় অ্যাং ব্যাং চ্যাং কিসব—
মানুষ থাকেনা ভূত থাকে যাদের দেখে বোঝা যায়না—
লিখেছ—হ্যাঁ ! লেখ—
সত্যি কথা বলে আবার সত্যপথে চলে ঐ যে দখিন দেশে—
খেতে পায়না, গান লেখে –পরের দুঃখে চোখেতে জল আসে—
মোটকথা এই সমস্ত ছোটলোক বাদ !

মন্ত্রী : বুঝেছি—এদের কত অপরাধ ! অমানুষ নয় বলে—

রাজা : এ্যায় ! বড্ড দেরীতে বুড়ো বুদ্ধি তোমার খোলে—
জাত বেজাতে ছুঁলে
রাজপ্রাসাদে এলে
গৃহদেবতা গর্বদেব যাবেন ছেড়ে চলে—
তখন কাদের নিয়ে থাকব ? ঐ চামার গুলো—

মন্ত্রী : ধন্য রাজা—বেশ তা নয় হোলো—
বিয়ের কদিন এইদেশের সব মানুষগুলো বাদ—
বিশেষ করে নদীর ওপারে থাকে যারা—বেশ।
এবার আমরা ভৃত্য তোমার - আছি অবশেষ।
আমাদের কি ব্যবস্থা ভিন্ন ?

রাজা : রাজার চাকর কম কি পুণ্য ! তাই তোমরা থাকবে !

মন্ত্রী : জয় হোক মহারাজ ! লিষ্টিঠিক করে তোড়জোড় করি তবে—

রাজা : যাও ! সব ঠিকঠাক মনে থাকবে ?

মন্ত্রী : মনে না থাকলে মাথা থাকবেনা / হাড়েহাড়ে জানা
পেন্নাম হে রাজন
বজ্রাঙ্গ সিংহদমন !

## দৃশ্যান্তর

( আদীবাসী পোশাকে বা সহজ সরল গ্রাম্য নর নারীর আনন্দনৃত্য চলছে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের পশ্চাদপটে আনন্দের অকপট অভিব্যক্তি তাদের নাচে গানে )

(গান) নদীর জলে খুশীর তুফান আজ রে
বাঁশীর বুকে আনন্দগান আজ রে
আকাশের নীল ঝিলমিল ঝিলমিল
আলোর নতুন সাজরে ॥

উথলে ওঠে আজকে রে ঐ ধানের ক্ষেতে ঢেউ
নেইকো ঘরে এমন দিনে কেউ
কেবল মজা আনন্দগান নেই কোন কাজরে ॥
বাজরে ঝাঁঝর বাজরেবাঁশী বাজ
পেটভরে আজ খাওয়ার দিন
ডাক দিয়েছেন মোদের মহারাজ রে ॥

১ম ॥ চলো চলো সবাই পা চালিয়ে চলো। রাজপুরীর মাঠে তাঁবু কানাতে ঢেকে যাচ্ছে জায়গা পাবেনা—

২য় ॥ ওঃ বাজনা, বাদ্যি, বাজি, আরও কতকি! পেতায় যাবিনা চোকে না দেকলে। মহারাজের জয় হোক! আমাদের মতো গরীব প্রজাদের ভোলেননি চলো চলো—

( চলতে থাকে ) দৃশ্যান্তর

[ রাজঅন্তঃপুর। রাজকন্যা কুমুদ। তাকে ঘিরে সখিরা নাচছে, গাইছে ]

গান : এলো মধুর বার্ত্তা নিয়ে এলো রে ফাগুন
জীবনের বনে বনে পলাশ শিমুলে দিয়েছে আগুন
বসে থেকো না ॥

সখি তোল মুখ লাজে ঢেকো না
শরমে মরম কথা ঢেকে রেখো না
মন বলে বলি বলি ফোটেনা সে মুখ কলি
মন মানেনা ॥



বুকের গোপন কোনে স্বপনে জাগরণে
চরনের ধ্বনি বাজে সওয়া যায়না ॥
আসছে লুটেরা কোন দূরদেশ হতে
ফুলের বাঁধন নিয়ে লুটে নিয়ে যেতে
প্রেমের গোপন ধন ঢেকে রাখা যে যাবেনা
দ্বার খোলোনা ॥

রাজকন্যা : সখি মাধবী মঞ্জরী তোর দুটি পায়ে পড়ি
ভালো লাগেনা—

মাধবী : সেকি কথা প্রিয় সখি কি হল তোমার
খুলে বলোনা —

রাজকন্যা : আমার বিয়ের উৎসবে যে বাজবেনা তার বাঁশী
ছোটবেলার বন্ধু আমার দিলখোলা উদাসী ॥
তার বাঁশী তে সুর না যদি বাজে, তবে
এত আলোর নেই প্রয়োজনে
মৃত সে উৎসবে ॥

মাধবী : কে সে বাঁশীওলা ! বল
মা রাণীকে বলছি গিয়ে হোসনাকো চঞ্চল –

রাজকন্যা : ধবল পাহাড় পুবের দেশে রূপসী নদীর ধারে
মউল গাঁয়ে পাতার কুটির গড়ে ওরা থাকে।
ওদের ছোট ছেলেটা তার মধুবংশী নাম
মনে নেই তোর ? চড়ুইভাতির দিনে বন্ধু পাতালাম—
তমাল পাতার পাত্র গড়ে খেলায় শালিধানের চিড়ে
মুলী গরুর দুধে মেখে —মিষ্টি ঝর্ণা জল
বড় বড় সরল চোখে হু হু করা কান্না সুরে
বাজিয়েছিল বাঁশী |
বলে ছিল "মিত্রানী তুই ভুলিস না কো গরীব বন্ধুকে
তোর বিয়াতে যাবই যদি বুলাস আমাকে
বাজাব তোর বিয়ার রাতে নীল আকাশের সুর
দুধাই ঝর্ণা জলের থেকেও বহুত সে মধুর।"

বলেছিলাম বন্ধু তোমায় ভুলবনা
ভুলবনা তোর বাঁশী—
চাই তাকে এনে দেনা বন্ধু সে উদাসী—

মাধবী : হায় হায় একি সর্বনাশ শুনলে রাজা
ভীষণ দেবেন সাজা—
ভুলে যা সই সেই ছেলেকে
এতকথা কেউ মনেও রাখে
কত রাজা আসছে, রাজপুত্র, কত মানুষ গুণী
এর মধ্যে কষ্টি কালো ছোটলোক সে—

রাজকন্যা : খবর্দার ! কোনদিন না শুনি ! তোর মুখে ঐ কথা।
ভয়ে ভয়ে মরে থাক রোজ, আমি একবারই
দেবো মাথা—
যদি আমার বন্ধু কে নাই ডাকা হয়
শেষ কথা বলে দিলাম করবো না কো ভয়
জীবন দেব তবু মালা বদল করবো না
ছিঁড়ে ফেলব সাজ যত আর সাজাবো না

মাধবী : মাফ কর সই কি যে আমি কই
মনে রাখিসনা
মন্ত্রীকে বলি সব নইলে পণ্ড এ উৎসব
চাই সে মন্ত্রণা
[ দৃশ্যান্তর ]

[ রাজার ঘর। উত্তেজিত রাজা পায়চারী করছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রবেশ ]

রাজা : এইযে বুড়ো খবর কি ?
মেয়ে আমার মেনেছে তো বশ
সিংহদমন বংশের সব মান সম্মান যশ
এসবই তো বড়ো। বোঝাতে পেরেছ বুড়ো—

মন্ত্রী : আজ্ঞে মহারাজ ! স্বয়ং আপনি চলুন
যা বলার তা বলুন—



রাজা : বটে – চলো দেখাই তোমায় কাকে বলে শাসন
মানিয়ে তবে ছাড়ব আমি রাজা সিংহদমন –
[ দৃশ্যান্তর ]

রাজা : কুমুদ ! তোমার বিয়ে আসছে সাতই
তুমি এদিকে নিত্যি নিতুই
বেয়াড়াপনা কচ্ছ—
তোমার বাপ যে সিংহদমন তা ভুলছ।
অজাত বেজাত রাজপুরীতে ঢুকবেনা—
শেষ কথা—

রাজকন্যা : মধুবংশী বন্ধু আমার তাকে আনা চাই
বিয়ের বাসর উৎসবে তার সুর বাজা চাই
নইলে বিয়ের তোমার সব আয়োজন
মিথ্যে সব বৃথাই

রাজা : এক চড়ে বদন বিগড়ে দেব
গুনে গুনে ঐ দাঁতগুলো খুলে নেব—চেননা আমায়
অসভ্য যত অমানুষ গরীব বর্বর
পুব পাহাড়ী, দখনো কিছু, পশ্চিম দো ঘর
তাদের মাঝেই বন্ধু ওনার ইয়ার্কী আর কী !
সিংহদমন বংশে মানুষ বেঁচে আর নেই কী ?
বংশের মুখে চুনকালি শত্রুরা দেবে হাততালি !
ওসব চলবেনা – সোনার চিঠি ছাড়া কেউ আর
আসবেনা—
মানুষের ঘরে অমানুষের এক উৎপাত—

কুমুদ : তোমার রাজত্বে যারা থাকে, তারা যদি সব অমানুষ
তুমি কাদের রাজা ? হায় ! একই দেশের ফলে জলে
একই আকাশ নীলের তলে/একই মাটির ফসল ফলে
তাদের সবাই না এলে, কেমন করে উঠবে দুলে
উৎসবের প্রদীপ, উঠবে ভরে মাঙ্গলিক কলস ?
বাবা তোমার আমার ভাই তো তারা—

রাজা : কি বললি লক্ষীছাড়া—
ঐ ছুঁচো গুলো আমার ভাই
বুঝেছি তোর কোন ওষুধ চাই
বন্দী হয়ে থাক এঘরে বিয়ের দিন অবধি
কোথা গেছিস যদি—ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।
দেশের সমস্ত বাঁশীওলাকে আনিয়ে দিচ্ছি
সুর শোনাবে শোন
বসে বসে দিন গোন
বলে কিনা আমরা সবাই এক!
মজাটা এবার দ্যাখ—

## গ্রন্থিক

দেশদেশান্তরের বাঁশীওলা এসে নানান কালোয়াতী সুর শোনাতে লাগল রাজকন্যেকে। হাঁফিয়ে উঠে রাগে, দুখে অচেতন প্রায় হয়ে বিছানা নিল রাজকন্যে। এদিকে আর তো মাত্তর চারদিন বাদে বিয়ে। রাজা রাণীর ঘুম নেই। মন্ত্রী পাকাদাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সেদিন ঘুটঘুটি রাত। রাজকন্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। রাজার সেরা বৈদ্য আয়ুর্বেদাশ্রী ভিষগাচার্য্য গম্ভীর মুখে খলনুড়িতে ওষুধ মেড়ে খাওয়ালেন। তারপর নাড়ী ধরে চোখ বুজলেন। চোখ খুলে তাকালেন। নাড়ীধরে থাকা হতাশার ভঙ্গী করলো। বল্লেন—

বৈদ্য : বাইরের বাঁশীর অত্যাচার থামান মহারাজ। রাজকন্যা ঘুমের ঘোরে চমকে উঠছেন। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে—
[ রাজা ইশারা করলেন। বাজানা বাদ্যি সব থেমে গেল। রাণী ফিস-ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ]

রাণী : বৈদ্যাচার্য্য ও কেমন আছে? বলুন না!
বৈদ্যকথার উত্তর দিলেন না। মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন রাজা ও মন্ত্রী। অস্বস্তিকর নীরবতা। ছটফট করছেন রাজা। মন্ত্রীর দিকে গিয়ে তিনি মন্ত্রীর দুহাত জড়িয়ে ধরলেন। বোঝা গেল তিনি চঞ্চল হয়ে পড়েছেন ]



মন্ত্রী : মহারাজ! আমার তো লক্ষন ভালো ঠেকছেনা। আপনি যদি আমার কথা শোনেন তো ঘোড়া পাঠান পূবের দেশে নদীর ধারে ছেলেটার নাম মধুবংশী—

রাজা : খবর্দার! চুলোয় যাক সব—ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব! খবর্দার—

মন্ত্রী : মহারাজ এইদেশেরই লোক ওরা একই নদীর জলে, একই ভাষায় কথা বলে একই—

রাজা : মন্ত্রী খবর্দার! ওদের ধর্ম অন্য—ওরা গর্বদেবের পূজো করেনা ওরা বলি মানেনা ওদের ডাকব মেয়ের বিয়েতে খবর্দার—

মন্ত্রী : রাজামশাই! আপনার বাবার আমল থেকে আমি আপনাদের সুখে দুখে আছি। আমার বয়স হয়েছে। আমার কথা রাখুন। বাইরে দেখুন ঝড়ের পূর্বাভাস! থম থম করছে চারদিক। গর্বদেবের নাটমন্দিরে আরতি প্রদীপ নিভু নিভু। মানুষের মধ্যে দেবতা নিশ্চয় আছেন। তিনি বোধকরি রাগ করেছেন—জাত ধর্ম ভাষা যাইহোক, পূবে থাকি আর পশ্চিমে থাকি একদেশের মানুষ আমরা—আর দেরী করবেন না মহারাজ মধুবংশীর বাড়ী ঘোড়া পাঠান—

রাজা : ( হুংকার দিলেন ) মন্ত্রী! সাবধান গর্দান নেবো—
সেই গর্জনে আর্ত্তস্বর মিশে গেল রাণীর : কুমুদ! কুমুদরে! চোখ মেল—

রাজা : ( চমকে ফিরলেন—এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বৈদ্য গম্ভীর মুখে নাড়ী ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ) বৈদ্যরাজ!

বৈদ্য : আমার চিকিৎসা ব্যর্থ মহারাজ! আর খুব বেশী সময় নেই। প্রদীপ নিভে আসছে। আপনার দেবতাকে স্মরণ করুন—

রাজা : গর্বদেব! একমাত্র গর্বদেবের মন্ত্রই বাঁচাতে পারে ওকে মন্ত্রী ডাকো পুরোহিতকে—

রাণী : মিথ্যে! মিথ্যে তোমাদের গর্বদেবের সব গর্ব—আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি মানুষের দেবতার মন্ত্র ছাড়া মেয়ে আমার বাঁচবেনা—তুমি ডাকো মধুবংশীকে নইলে আমি যাব—

রাজা : ( রাজা খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন ) খবর্দার! এক পা বাড়িয়েছ কি গর্দান নেবো—সিংহদমন বংশের মেয়ে গর্বদেবের মন্ত্রে যদি না বাঁচে তবে বাঁচবে ঐ অমানুষ বর্বরের বাঁশীতে খবর্দার—

রাণী : ( ঠেলে বেরোতে যাচ্ছেন ) আমি যাবই—আমি যাবই—

( রাজা তলোয়ার তুললেন ) রাণীকে আঘাত করতে উদ্যত। হতভম্ব বৈদ্য ও মন্ত্রী চরম মুহূর্তে চরাচর কাঁপিয়ে বাঁশী বেজে উঠল। থেমে গেলেন রাজা—চমকে উঠে তরোয়াল পড়ে গেল হাত থেকে। কাঁপতে কাঁপতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। স্খলিত স্বর বেরোল—

রাজা : ওকে আসতে দাও—বুঝেছি সে এসেছে—

রাণী : মধুবংশী ! মধুবংশী !

বৈদ্য : জয় ধনন্তরী ! রাজকন্যা চোখ মেলে চেয়েছেন—

( ধীরে ধীরে এক শ্যামল কিশোর ঢোকে বাঁশীতে সুর বাজায়। রাজকন্যা ধীরে ধীরে উঠে বসেন। রাজা ছুটে বেরিয়ে যান। মঞ্চে ঢোকে আরও সাধারণ মানুষেরা—রাজকন্যা হাসেন )

### দৃশ্যান্তর

রাজকন্যা নাচছেন। তাঁকে ঘিরে সখিরা নাচেন। বাঁশি বাজায় মধুবংশী। রাজা-রাণী হাসেন। চোখে জল। মন্ত্রীর পাকাদাড়ি আনন্দে দোলে )

গান :

আজ পুণ্য হলো ধন্য হলো উৎসব
দূরে গেছে চলে সকল আঁধার
বিভেদের অনুভব ॥
মানুষের ঘরে মানুষের বাঁশী
বলছে ডেকে মোরা ভালোবাসি / উঁচুনীচু আছে সকল মানুষ
ধনী নির্ধন সব।
সকল পূজার একই মন্ত্র মানুষের মন্দিরে
একই মানুষ ভিন্নরূপেতে জীবনের সব ঘরে।
আজ আনন্দ নন্দিত তাই গানে
মধুলগ্নের হলো সমাগম সকলের প্রাণে প্রাণে
পূর্ণ প্রাণের মঙ্গল পল্লব ॥

শুভম্



# ইন্দিরা ঃ জোটনিরপেক্ষ ও বিশ্বশান্তি আন্দোলনের উজ্জ্বল পারাবত

তাপস তলাপাত্র

১০১টি দেশের একশ পঞ্চাশ কোটির ও বেশী মানুষের শক্তিতে সমৃদ্ধ আজকের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নিরপেক্ষ একটা জোট তৈরী করাই বুঝি এই আন্দোলনের মূল লক্ষ। বস্তুতঃ এই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের লক্ষ হল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করা। এই আন্দোলনের অর্থ হল সদ্যস্বাধীন দেশগুলির উপর অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রবলতম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই বলা যায় পক্ষ তো একটা রয়েছেই—আর তা হল বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত কারীদের বিরুদ্ধ পক্ষ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ১৯৫৫ সালের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সম্মেলনে ২৯টি দেশ যখন ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বেড়াজালকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মানুষের অধিকারের প্রশ্ন তুলে নিপীড়িত জাতিগুলিকে রক্ষা করার মন্ত্রে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল তখনই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল লক্ষটা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। পাশাপাশি এও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে আজকের বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার এক মহান দায়িত্ব পালন করেছে এই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। এমত এক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা দেশগুলির অন্যতম ভারতবর্ষ। সম্প্রতি, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী নির্বাচিত হয়েছিলেন এই জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির চেয়ার পারসন্। ও নিজেকে প্রমান করেছিলেন সারা পৃথিবীর কাছে শান্তি আন্দোলনের এক অনন্য প্রহরী হিসাবে।

জাতি সমূহের স্বয়ম্ভরতা ও নিরস্ত্রীকরনের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে যে বিশ্বশান্তি সম্ভব নয় এ বিশ্বাস ইন্দিরার ছিল। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষনে তিনি বলেন—উন্নয়ন, স্বয়ম্ভরতা, "নিরস্ত্রীকরণ, এবং শান্তি পরস্পর অচ্ছেদ্য।"—প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর এমত মত পোষণ ও তাঁর কর্মপদ্ধতিকে একই সরলরেখায় সাজানো সম্ভব।

উন্নয়ন ও স্বয়ম্ভরতার প্রশ্নে তিনি একদিকে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন তেমনি ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে আসতে সচেষ্ট ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায়, শিল্পে কিংবা কৃষিজ সম্পদে। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার অভাবকে কাজে লাগিয়েই মূলতঃ আজকে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হতে চলেছে। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত ভারবর্ষকেও যখন আজকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার জন্যে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে তখন মার্কিনী চক্রান্তও বুঝি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে ভারতবর্ষের ওপর, ভারত যেন স্বয়ম্ভরতাকে গ্রাস করার জন্য। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আঙ্কেলেশ্বরের তৈলখনি থেকে তেল উত্তোলনে সোভিয়েত সহযোগিতার কাছে তাই দেখি, মার্কিনীদের ঐ আঙ্কেলেশ্বরে তেল উত্তলনের ক্ষেত্রে ভূয়া সহযোগিতা ম্লান হয়ে যায়। সেই খেলা আজও চলছে। তাই ইন্দিরাগান্ধী বুঝেছিলেন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে মিত্রতা ব্যতিরেকে স্বয়ম্ভরতার সংগ্রামে জয়ী হওয়া যাবে না। তাই বিবিধ শ্রমশিল্প ও অন্যান্য প্রকল্প নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কারিগরী সাহায্য ও ঋনদানের (যেগুলির অধিকাংশই হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রীয় ঋনদানের ভিত্তিতে) প্রতি আস্থাশীল হয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। স্বয়ম্ভরতার প্রাসঙ্গিকতায় একথা আলোচনা করা যেতে পারে যে পশ্চিমী দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত ঋনের তুলনায় সোভিয়েত থেকে প্রাপ্ত ঋনের কতগুলি উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে। তার একটি হল ঐ ঋন বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয় না, করতে হয় ভারতীয় মুদ্রায়। যদিও ঐ মুদ্রার সম্পূর্ণ অংশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় সামগ্রী ক্রয়েই ব্যয় করে থাকে। তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এক সরকারী সফরকালে ইন্দিরাগান্ধী অকপটেই ঘোষনা করেন—"সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানই নয়, সমানাধিকার, পারস্পরিক অবস্থা ও কল্যাণের ভিত্তিতে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও একযোগে কাজের সুস্পষ্ট প্রকাশ।"

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে সেখানকার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ইন্দিরাগান্ধীর ভূমিকা আজকের শান্তি আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রাসঙ্গিকতায় দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের ইস্পাত প্রমাণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেলসন মেণ্ডেলার লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে নেহেরুর ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাশাপাশি লেখেন—"আজকে



আমরা এটা দেখে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত যে তার সমপরিমান খ্যাতকীর্তি কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঐ একই পথে চলেছেন অম্লান জীবনী শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে। তার কার্যক্রম তার আগ্রহ, তার উক্তিসমূহ আমাদের পক্ষে আশা ও উৎসাহের চিরন্তন উৎস হয়ে রয়েছে।"

এছাড়াও স্বয়ম্ভরতা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে ডিয়েৎনামের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন কিংবা সাম্প্রতিক কালের কাম্পুচিয়াকে স্বীকৃতিদান বিশ্বশান্তি বিঘ্নিতকারী শক্তির বিরুদ্ধে একটা জোরালো ভূমিকা বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাই বোধ হয় ইন্দিরাগান্ধীকে বাঁচিয়ে রাখাটা কারো কারো অসহ্য মনে হলো। বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে ভারতবর্ষের ভূমিকাকে স্তব্ধ করে দিতে ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হল। পাঞ্জাবে তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল 'খালিস্তানী' সরকার অর্থাৎ সবে মিলে ভারতবর্ষকে উত্তেজিত রাখার সাম্রাজ্যবাদীদের এক ব্যাপক পরিকল্পনা—যার দোসর দেশীয় রাজনীতির দিকে তাকালে খুঁজে বের করে নিতেও অসুবিধা হয় না। উগ্রপন্থীদের ঠেকাতে স্বর্ণমন্দিরে সৈন্য প্রেরণে সমর্থন যুগিয়ে—সৈন্যদল বেশীদিন থাকবে না কমদিন থাকবে এই নিয়েই বিরোধীতা সৃষ্টি অথও ভারতের স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটায় কিনা তা ভেবে দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ইন্দিরাগান্ধী ঘোষনা করলেন—"আমরা আমাদের সকলের অভিন্ন ভবিতব্যের প্রতি দায়বদ্ধ। এই পৃথিবী আমাদের সকলের। তাই আসুন এর সম্পর্কে আমরা শান্তি ও প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সচেতন হই।" এই বক্তব্যের পিছনে নিরস্ত্রীকরন আন্দোলনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের যে মহান সত্যটি লুকিয়ে আছে তা ধরে ফেলেছিল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। তাই তাদেরও প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াল ইন্দিরা গান্ধী। আততায়ীর গুলিতে সরে যেতে হল তাকে। এখন এটাই দেখার বিষয়, বিশ্বশান্তি আন্দোলনে ইন্দিরাগান্ধীর ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ভারতবর্ষ নিজেকে নিয়োজিত করবে নাকি "তোমরা শত্রু আমার শত্রু ইন্দিরা গান্ধী"—এই শ্লোগানের আড়ালে দেশীয় শক্তির সঙ্গে দেশের বাইরের অশুভ শক্তির গোপন আঁতাত—দেশকে খণ্ড খণ্ড করার মত জঘন্য পরিকল্পনায় মত্ত হয়ে দেশের শান্তি তথা বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে কলুষিত করতে শান্তি আন্দোলনে আততায়ীর কাছ থেকে ছুটে আসা গোলটি বুলেটই প্রাধান্য বিস্তার করবে।

# ঘৃণাজনিত

## হীরক সেনগুপ্ত

খানিক দৌড়াইলেই তাহার ফুস্‌ফুস্‌ গুটাইয়া আসে। ঔষধ গিলিয়া গিলিয়া হৃৎযন্ত্রটি, দিনে দিনে ভাঙ্ক, এবং ফাঁপিয়া গিয়াছে। সামান্য পরিশ্রমেই, ক্যাম্বিস, বলের ন্যায় উহা লাফাইতে থাকে।

শরীরময়, কাপুরুষ অস্তিত্বখানি, মাথা গুঁজিবার নিমিত্ত ছুটিয়া বেড়ায়।

বিগ্রহের মধ্যে যেইরূপ প্রাণ থাকে না; বিক্রমের দেহখানিও, ক্রমশঃ, তেমনি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। কেবল পার্থক্য এই; বিক্রম, মাতাপিতার সঙ্গমের অসতর্ক মুহূর্তে, জন্মগ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

বিক্রম অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিল কিনা তাহা বলিতে পারিনা। তবে সে এইটুকু জানিত -বহুর বহুর ফেল করিয়া তাহার বুদ্ধিটি নাকি রেশনের কাপড়ের মতন সস্তা ও লঘু হইয়াছে। এক সময় বাকলে পরিণত হইবে। কোন জটিল ব্যাপারে তাহার মাথা গলাইবার সাধিকারটুকু ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সহজ ব্যাপারই জটিল ঠেকে। আর জটিল ব্যাপার? নাঃ, অতদূর প্রবেশ করিয়া লাভ নাই।

বিক্রমের বুদ্ধির অগ্রভাগ নাকি ভোঁতা। উহার দ্বারা যে একখানি চড়াই পাখিও শিকার করা যাইবে না—ইহা কোনই নতুন কথা নহে। স্বভাবতই এসব ভাবিয়া কূলে পৌঁছিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। কেবল বুঝিল; সে কার্য্য-কারণে বাধা পড়িয়াছে। ছাড়াইবার উপায় নাই। এই সমস্ত বালকের একমাত্র সঙ্গী হইল মরিয়ার হাসি। বিক্রমেরও হাসি পাইল।

……মা কি একবারও ভাবিল না? যে নিরাপত্তার খাতিরে বিক্রমকে তৃপ্তির সঙ্গে পাঠালেন—এ ব্যাপারে অন্ততঃ বিক্রমঃ একেবারেই অনুপযুক্ত। সে



কিনা তৃপ্তিকে পাহারা দিয়া লইয়া যাইতেছে নির্বিঘ্নে, রাতের অন্ধকারটুকু পার করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য? কি আর হইতে পারে? বড় জোর দুরবৃত্ত তৃপ্তিদিকে অন্ধকারে…বিক্রমের কিস্‌স্যাই করিবার ক্ষমতা নাই। তৃপ্তিদি একাই একশো। স্কুলে দৌড়ে প্রতি বছর ফার্স্ট প্রাইজটা তৃপ্তিদির বাঁধা থাকিত। ফ্যাসাদে পড়িলে ও নিজেই বুলেটের বেগে দৌড়াইতে পারিবে। আর জলে তো কথাই নাই। তৃপ্তিদি যেন একটা তেচোখা মাছ! ধরিবার জো নাই। তৃপ্তিদি নিজেই নিজেকে বেশী করিয়া রক্ষা করিতে পারিবে। বিক্রম কোন কাজেই আসিবে না।

তবুও, হাবজী খোজা হইলেও পুরুষ, পুরুষই। মনে মনে ঈশ্বরকে রসিক না বলিয়া উপায় নাই। তাহা না হইলে কিসের নিমিত্ত তিনি একখানি সোনালী বুকিফেলাসের সঙ্গে অপর একখানি খচ্চর জুতিয়া দিবেন?

রাত একটু অধিকই হইয়াছিল। সৌদামিনী দেবী, তৃপ্তিকে ছাড়িতে ভয় পাইতে ছিলেন। দিনকাল খারাপ পড়িয়াছে।

যাগগে বলিয়া সমস্ত ভাবনা বিক্রম যেন এক ফুঁয়ে উড়াইয়া দিল।

(২)

বড় রাস্তায় পা রাখিয়া; বিক্রম এই সব ভাবিয়া একটু মুচকি হাসিল। কোন শব্দ হয় নাই। তবুও তৃপ্তি টের পাইল; বিক্রম হাসিতেছে। -'গাধার মতন হাসছিস কেন রে?' বিক্রম, অন্ধকারে তৃপ্তির ভ্রূ-যুগলে যে তরঙ্গ খেলিয়া যাইল; উহার শব্দ যেন শুনিতে পাইল। রাস্তাখানি লোকচলাচল শূন্য হইয়া—এমনিই নির্জন হইয়াছে।

—'এমনি'

—'এমনি না কচু। বলবি না তাই বল।' বিক্রম বুঝিল না ইহা অনুরোধ কি অভিমান। তবু কোন উত্তর করিল না। এতটা রাস্তা যাইতে হইবে, তাই তৃপ্তি বোধহয় বিক্রমের সহিত ইতস্ততঃ লঘু কথাবার্তায় মগ্ন ছিল।

—'হ্যারে; কুঞ্জর খবর কিছু জানিস?' যদিও কুঞ্জদা একসময় তৃপ্তিদির সহিত একই শ্রেণীতে পড়িত, ও এখন বিক্রমের সঙ্গে পড়ে। তৃপ্তি ইতিপূর্বে; কুঞ্জ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ কোনদিনই প্রকাশ করে নাই। তবে কৌতূহল অবশ্যই ছিল। বিক্রম সংক্ষেপে বলিল: 'ভালই'

'কি করছে রে ওটা? মতি গতি ফিরেছে? লেখাপড়া শুরু করেছে নাকি আবার? তাই যেন শুনলাম। পরীক্ষা দিয়েছিল না? পাশ-ফাশ করেছে?

বিক্রম প্রশ্নটি শুনিয়া তৃপ্তিদের মুখের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিল একবার। তৃপ্তিদির মুখের বাক্যগুলি যেন তাহার অন্তরাত্মাকে অবধি জানাইয়া দিল।

'কেন বল তো?' কুঞ্জর পাশের খবর চাপিয়া গিয়া ও পল্টা প্রশ্ন করিল—'তুমি কি একাই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করছ নাকি? আর কেউ পাশ করতে পারে না বুঝি?' কুঞ্জ পরীক্ষা দিয়াছে আবারও। এবং সে যে পাশ করে নাই ইহা সকলেই জানিত।

কোলিয়াড়া অঞ্চল। ছোট্ট, ঘিঞ্জি পরিবেশ। কেচ্ছা চাউর হইতে বেশী সময় লাগে না। মাটির তলদেশে কুলি-কামিনেরা যেইরূপ কয়লা কাটিয়া কাটিয়া স্থান শূন্য করিতেছে—মাটির ওপরকারেও তেমনই এক অবস্থা। ঘিনঘিনে লাগোয়া সমাজ। পরিবেশে অন্তরের সুষমা কেবলই কমিয়া আসিতেছে। সভ্যতার বিস্তারিত থাবা, সমস্ত শুষিয়া লইতেছে। কেনইবা তৃপ্তি বাছিয়া বাছিয়া কুঞ্জর প্রসঙ্গ তুলিল এ বিষয়ে খানিক ইতিহাস রহিয়াছে। কুঞ্জ যে পাশ করে নাই—ইহা কি তৃপ্তি জানিত না? জানিত। এবং বিক্রম অপেক্ষা বিশদরূপেই।

( ৩ )

তৃপ্তি, কুঞ্জ, ইন্দ্রাণী ( বিক্রমের দিদি ) এক সময় একই সঙ্গে পড়িত। তবে কি রূপে কুঞ্জ, বিক্রমের দলে আসিয়া পড়িল? উত্তর অতীব সহজ। ক্লাশের পরীক্ষায়, বোর্ডের পরীক্ষায় সে একাধিকবার ফেল করিল। খানিকটা শিঙ্ ভাঙ্গিয়াই, বিক্রমের দলে তাহার প্রবেশ। বিক্রম তখন খুবই ছোট। দিদির মুখে কয়েকবার ঘৃণ্য ভঙ্গীমায় কুঞ্জদার নাম শুনিয়াছিল। কুঞ্জ, নাকি তৃপ্তির পিছনে লাগিয়াছিল। প্রত্যহ বিকেল বেলা স্কুল হইতে ফিরিবার পথে, বিক্রম দেখিত কুঞ্জদা মোটর সাইকেল লইয়া কোথায় যেন যাইতেছে। যত্নে পাট করা লম্বা চুল; জামা গুজিয়াছে; ঘোর গ্রীষ্মকালেও কখন পা হইতে হাণ্টার শু খুলিতে দেখে নাই কুঞ্জর। কুঞ্জদার মোটর সাইকেলে বার কয়েক বিক্রমও চড়িয়াছে।

'ও কুঞ্জদা আমাকে নিয়ে যাবে গো?' স্কুল হইতে ফিরিবার পথে বিক্রম কখনও সখনও অনুরোধ করিত।

বিক্রমের তখন বয়স অল্প। কুঞ্জদার মোটর সাইকেলে বসিয়া, বায়ু সমুদ্রের মধ্য দিয়া সশব্দে, উন্মাদ গতিই তাহার ভাল লাগিত। কুঞ্জদার চওড়া কাঁধে



বিক্রমের রোমহীন, লাজুক হাত। দুই পাশে পা ফাঁক করিয়া বসিলেই তাহার হৃদপিণ্ডটি সৈনিকের আদেশে অপেক্ষারত বন্দুকের মতন গর্জিয়া উঠিত। বারুদের ঘ্রাণ। হত্যাকারীর তৃপ্তি অনুভব, প্রতিটি প্রসিপ্ত অংশে।

কুঞ্জর যেদিন যেদিন মন ভালো থাকিত, তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিত। তখন কুঞ্জর যে বয়স ছিল; বিক্রমের এখন ঠিক সেই বয়স। বড়োজোর বছর পাঁচেক কাটিয়াছিল। যে সময়টুকু পরীক্ষার নির্ধারিত ঘণ্টা বাজাইবার পূর্ববর্তী মিনিট স্বরূপ। ফার্স্ট বয় যখন খাতা রিভিশন করিবার পর জমা দিয়া; উদ্ধত গ্রীবায় হল হইতে বাহির হইয়া গেল; কেউ তখন নূতন চোতা বাহির করিল মাত্র। কুঞ্জ হয়ত আরও পাঁচশ বছর বাঁচিবে। কিন্তু সেই সময়ের সবটুকুই হইবে; এই অংশের জৈবনিক রোমন্থন। আত্ম প্রহসনে যখন; অনর্গল ভিতর 'বাড়ীর কুঞ্জ' অট্টহাসিতে; নিজের ঠোঁটের চামড়া টানিয়া তুলিবার মতন যন্ত্রণায় মাতিয়া উঠিবে।

ইশ্বর দয়ালু কিনা বলিতে পারি না। তবে এই যুবকেরা বারেকের জন্যও জীবনযুদ্ধে অসতর্ক, অমনোযোগী হইলে ক্ষমা করেন না! কুঞ্জর স্কুল ফাইনাল পাশ করিতে করিতে দীর্ঘ সময় নষ্ট হইল। মাকাল ফলের মতই তাহার অত সুঠাম চেহারাও কদর রহিল না। বারবার একই পরীক্ষা একজন বালষ্ঠ মানুষকে, পাশ করিতে না দিয়া কাগজের মতন মুড়াইয়া মুচড়াইয়া দিবার ক্ষমতা রাখে। অন্ততঃ সেই দেশটিতে।

কিছু একটা করিতে তো হইবে। প্রথম প্রথম কালোবাজারে টিকিট বিক্রয় তাহারও পরে আরও কত কি? এখন প্রায়শই কোলিয়াড়া হইতে কয়লা বোঝাই মালগাড়ী লুট হয়; তাহার মধ্যে যে কুঞ্জ নাই একথা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে না।

বিক্রম এই সব ঘটনা কুঞ্জর বয়সে পৌছাইয়া জানিয়াছে।

( ৪ )

নেহাৎই এতখানি পথ নিঃশব্দে হাঁটা অস্বস্তিকর বলিয়াই, তৃপ্তি স্মৃতি হাতড়াইয়া কুঞ্জর প্রসঙ্গ পড়িয়াছে—এ সম্বন্ধে বিক্রমের কোন সন্দেহ নাই। কুঞ্জর আক্রমণে অতীতে জীবনের যে অংশটুকু উপদ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল—তৃপ্তি তাহার প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার ভয়ংকর সুন্দর হিংস্র মানসপটে তখন নীরব তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িতেছে।

তৃপ্তিরা এমনই। তাহারা সুন্দরী, তন্বী হইয়াই সর্বদা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা পায়ে নূপুর পড়িয়া নাচিতে ভালবাসে। নিক্কনধ্বনি রক্তের মধ্যে কি করিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়া; দোলার সৃষ্টি করে—কেহ বলিতে পারে না। তৃপ্তির নিষ্পাপ মুখশ্রী হইতে পেলব পদযুগল অধিকমাত্রায় হিংস্র। দুই-একখানি ঘুঙুর বেতালে এদিক-সেদিক ছিটকাইয়া পড়িলেও উহা থামিয়া থাকে না। তাহার ভালই লাগে। মূহুর্তে; নৃত্যবতার শরীর হইতে; মুদ্রার বিভঙ্গ হইতে; বিচ্যুত হইয়া, আপন পরবশ ধ্বনিতে বাজিতে বাজিতে কেমন করিয়া প্রাণের গুঞ্জন থামিয়া আসে! তাহা দেখিয়া তৃপ্তির চোখ জুড়াইয়া যায়॥ আহা!

অন্ধকার যখন ঘন হইয়া আসিয়াছে নক্ষত্রের ঠাস বুননে; যখন পৃথিবী তাহার আপন অক্ষের অপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তখন; একজন ভাগ্য বিড়ম্বিত যুবকের অস্বস্তিকর জীবনের পর্যালোচনা করিয়া, খানিক সোয়াস্তিতে পথ হাঁটিবার কৌশলটি বিক্রমকে অকারণ ব্যাথা দিয়া গেল। বুদ্ধির খেলায় বিক্রম পরাস্ত হইল। তীক্ষ্ম মেধা তাহারই, বোধহয় যাহার মেধার শানিত রশ্মি বাহিরে বিকাইয়া পড়ে। ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধাইয়া যায়। না। বিক্রম সে দলভুক্ত নহে। তবুও তাহার বহুবার, বহুবার মনে হইয়াছে সে সময় বড়ই দুঃখের; যখন দেবদূতেরা আমাদের এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় অন্যত্র। স্বাভাবিক প্রবণতা জাগিয়া ওঠে বিস্মৃতি আর অপরাধের পাড়ে।

বস্তুতঃ জীবন একটাই। বিক্রম, কুঞ্জও যাহা পৃথক পৃথক ভাবে বহন করিয়া যাইতেছে। দৈহিক সোয়াস্তি, অর্থ, যশ-ই জীবনের শেষ কথা বলে কিনা বুঝিবার ক্ষমতা নাই বিক্রমের। কেহই বলিতে পারে না আরও কয়েকখানি উদ্ভিদের প্রাণ ফসিল হইলে বিক্রম যে তলাইয়া যাইবে না। প্রকৃত পক্ষে কুঞ্জর সঙ্গে বিক্রমের গতি পথের তো বিশেষ পার্থক্য নাই।

কুঞ্জদা নোংরা রাজনীতি করে; কুঞ্জদাকে পুলিশ খুঁজিতেছে সর্বত্র, কুঞ্জদা নাকি ওয়াগান ব্রেকার, কুঞ্জদা মার্ডার করিতে এখন অভ্যস্ত—এসমস্ত কিছুই বিক্রমের অজানা নহে। তবুও কেমন জেদ চাপিয়া গিয়াছে তাহার। পাশের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়াইয়া গিয়া যাহা উত্তর দিল উহাতে শিষ্টাচার অপেক্ষা আক্রমণের ভাগই অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইল। জীবনের যে অংশে তৃপ্তি হাত ছোঁয়াইছে সেইখানেই সোণা ফলিয়াছে। বহিরাঙ্গিক সমস্ত উপকরণ তৃপ্তিদির ঝকঝকে; লোভনীয়। পরশ্রী কাতরতা কিনা বিক্রম স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিল না। কিন্তু, এই মূহুর্তে অবসাদে তাহার সমস্ত শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে।



—আচ্ছা তৃপ্তিদি; এই মূহুর্তে কুঞ্জদাকে তোমার খুব প্রয়োজন না?

—তৃপ্তি, বিক্রমের কথার মানে বুঝিতে পারিল না। খানিক অবাক হইয়া ঘাড় ফিরাইল। তাহার পর, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কেন?

কুঞ্জকে আমার কিসের দরকার। আমার কথার মধ্যে কোন অংশটা দরকারের মনে হ'ল তোর শুনি?

—নিশ্চয়ই দরকার আছে। কুঞ্জদা না থাকলে তোমার চলত না। কুঞ্জদার জীবনের এলোমেলো পদক্ষেপ, তোমাকে তোমার হিংস্রতার ইন্ধন যুগিয়েছে। অস্বীকার করতে পার না—জীবনে হিংস্রতার প্রয়োজন আছে। তুমি—

—'থাম থাম। ঢের বকেছিস ইন্দ্রাণীর ভাই না হলে এতক্ষণে টেনে, এক চড় বসিয়ে দিতাম তোর গালে।'

—'তুমি দিতেই পার। তবে আমার মনে হয় না তুমি চড়ের মতক স্থূল শাস্তিকে বেছে নিতে পারবে। তোমার পদ্ধতিটা হবে হয়ত আরও আধুনিক। অত্যন্ত শান্ত, পূর্ব পরিকল্পিত।'

ইন্দ্রাণী অসম্ভব চটিয়া গেল। বিক্রমের এই ঔদ্ধত্য তাহার অসহ্য মনে হইল। ঘুরিয়া সশব্দে একখানি চড় মারিল বিক্রমের গালে।

আপাততঃ এই স্থূল টুকুই গ্রহণ কর।

বিক্রম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না ইহাতে। বাঁহাতখানি গালের উপর রাখিল কেবলমাত্র।

তৃপ্তি হাঁপাইতে ছিল।

কি ব্যাপার তোমার শরীর খারাপ লাগছে?

—'না'

—তাহলে এত হাঁপাচ্ছ কেন? একটু ম্লান হাসিয়া বিক্রম বলিল, একটা চড় মেরেই ক্লান্ত হয়ে গেলে?

তৃপ্তির তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম। বিক্রমের এই চপলতায় সমস্ত শরীর ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল।

থাক গে। জানতে চাইছিলে না? কুঞ্জদা পাশ করেছে কিনা? না করেনি।

অন্ধকার কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিল তৃপ্তি। জানবার কোন দরকার নেই। তুই কি ভাবিস আমি তোর উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি! স্রেফ পরীক্ষা করছিলাম তুই কি বলিস॥

এই যে ঢালু পথ নাবিয়া গিয়াছে উহা সোজা সুবর্ণরেখায় গিয়া পড়িয়াছে। সুবর্ণরেখার জল এখন প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে। স্বল্প চাঁদের আলোয় চিক চিক করিতে দেখা যায় বালির মধ্যে লুকাইয়া থাকা অভ্র গুলিকে।

আচ্ছা তৃপ্তিদি তোমার সঙ্গে মা আমাকে পাঠাল কেন বল তো? যদি তোমাকে কেউ·····এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিক্রম দাঁড়াইয়া পড়িল।

—এই কিরে! দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—বল্লাম তো। আমি আর যাব না।

—মানে? আমি একা একা যাব নাকি?

হিন্দুস্থান কপার লিমিটেডের খনি হইতে ডিউটি বদলের সাইরেন বাজিয়া অমন তীক্ষ্ণ আওয়াজ তৃপ্তিকে একেবারে কাঁপাইয়া দিল।

—ইন্দ্রাণীকে গিয়ে কিন্তু ঠিক বলে দেব।

বিক্রম এক পাও নড়িল না। তৃপ্তি নিরুপায় হইয়া রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। ঘামে তাহার চিকন দেহখানি ভিজিয়া যাইতেছে।

কি বলবে দিদিকে গিয়ে? তোমাকে তো আমি কিছু করিনি। বিক্রম তাহার দিকে চাহিয়া বিষণ্ণভাবে হাসিল একবার। তুমি কি ভাবছ আমি জানি। আমি তোমার এই ঘুরী পোষাকটাকে অংশে অংশে খুলে নিয়ে শারীরিক উল্লাসে মেতে উঠব? তাই না?

প্লিজ; বিক্রম প্লিজ। হঠাৎ রেগে গিয়ে চড় মেরে ফেলেছি···আই মিন হিট অফ্ দ্যা মোমেন্ট প্লিজ বিক্রম! আমাকে···

সামুদ্রিক ঝড়ে যেভাবে মাটির চালা ধসিয়া পড়ে তেমন করিয়া তৃপ্তি ধীরে ধীরে বিক্রমের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

শোনো; তোমার শরীরকে স্পর্শ করতেও আমার লজ্জা হয়। শারীরিক উত্তেজনা হয়ত অন্য কারোর ক্ষেত্রে চলতে পারে কিন্তু তুমি নও। কেন না; তোমার প্রতি আমার ক্রোধজাত কোন বিকৃত যৌন উল্লাসও নেই।

কথা বলিতে বলিতে বিক্রম মুখ ফিরাইল। দেখিল, দূরে কাহারা যেন আলো হাতে করিয়া সুবর্ণরেখার কাঁচা সেতু পার হইয়া যাইতেছে। তৃপ্তির দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে সে। মুখ না ফিরাইয়াও বুঝিল; তৃপ্তিদি কাঁদিতেছে। নিস্তব্ধতাকে খান খান করিয়া বিক্রম চেঁচাইয়া উঠিল:

—কেননা আমি তোমাদের ঘৃণা করি তৃপ্তিদি।



# ক্ষণিক

## অরুণ ভট্টাচার্য

তুফানে যাচ্ছিলাম কলকাতা। স্টেশনে খুব ভীড় ছিলনা। মাসের শেষ বলেই কিনা জানিনা। থ্রি টায়ার স্লিপারে উঠে দেখলাম কামরাটাও বেশ ফাঁকা। হয়তো দুর্গাপুরের আগের স্টেশনগুলোতে যাত্রীরা নেমে গিয়ে থাকবে। ঝোলাটা বাঙ্কে রেখে বসতে না বসতেই দেখলাম এক ভদ্রমহিলা ৩-৪ বছরের একটা মেয়ের হাত ধরে আমার বিপরীত আসনে বসলেন। হাতের প্লাস্টিকের ব্যাগটা নীচে নামিয়ে রাখলেন। এক নজরে মনে হল মহিলা চল্লিশোত্তীর্ণা চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। টকটকে রং। ঝোলা থেকে "মনের গল্প সংকলন" বার করে পড়ায় মনোযোগ দিলাম।

পানাগড়ে গাড়ী দাঁড়াতেই পড়ায় ছেদ পড়লো সিঙাড়া আর চায়ের হাঁকা-হাঁকিতে। বই থেকে মুখ তুলে তাকাতেই ভদ্র মহিলার হাসিমুখ নজরে এল। একটু অবাক হলাম। স্মৃতির ভাণ্ডার হাতরেও ভদ্রমহিলা আমার পরিচিত বলে মনে হলনা। অপ্রতিভ ভাব কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাতেই ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বললেন 'আমায় একদম চিনতে পারেননি মনে হচ্ছে। অবশ্য চিনতে পারার কথাও নয়।' উনি আমায় চিনতে পারলেন অথচ আমি স্মরণে আনতে পারছিনা বলে লজ্জিত হলাম। 'বছর পঁচিশ আগের কথা স্মরণ করুন তো! আপনারা আপনাদের বন্ধুর দোকানে আড্ডা মারতেন আর আমরা দুবোন আপনার বন্ধুর দোকানে জিনিষ কিনতে যেতাম।' প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে মেয়েকে কমলালেবু বার করে দিতে দিতে আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন—'মনে পড়েছে?'

'মনে পড়েছে'। বলেই আমরা দুজনেই হাসলাম। দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা মনের পর্দায় ভাসতে থাকলো। বছর পনের বয়সের দুইবোন আমার বন্ধুর মুদিখানা দোকানে শুওদা করতে আসতো। আর আমি ও আমার বন্ধুরা, নীতু ও হীরেন—আমরা ওদের একটা বিশেষ নাম দিয়েছিলাম। ওদের ঘিরে কত রঙীন কল্পনাই যে করতাম তা মনে পড়ে যাওয়ায় এই বয়সেও বেশ লজ্জা পেলাম।

'আপনারা দুজনেই প্রায় একই রকম দেখতে ছিলেন। 'আমার এক বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও মিহুকে ও আমাকে সকলেই যমজ বলতো।' 'সে সময় বয়সটাই এমন ছিল যে আপনারা দুজনে আমাদের আলোচনার বেশ একটা স্থান অধিকার করে থাকতেন।'

'আপনি দুর্গাপুর ষ্টেশন থেকে উঠলেন কোথায় থাকেন বলুনত?' ভদ্রমহিলা আমাকে প্রথম যৌবনের স্মৃতিচারণ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। একটা বেসরকারী কারখানার নাম করলাম। 'আমরা কেউই পরস্পরের নাম জানিনা।' ভদ্রমহিলা বেশ সপ্রতিভতার সঙ্গে বললেন। 'আমার নাম চীনু তথা চিন্ময়ী আর আপনার?' 'শান্তনু ওরফে শানু' আমিও সহজ হওয়ার চেষ্টা করলাম।

'আমাকে চীনু বলেই ডাকবেন।'

আপনি থেকে তুমি ডাকার এই সহজ অধিকার পেয়ে ভালই লাগলো।

'তোমরা কোথায় থাকো বল্‌লে না তো!'

'আমরা টাউনশিপে থাকি।' মেয়ে বলে উঠল। বইটা সরিয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েও মার মত বেশ সপ্রতিভভাবে নাম বল্ল।

'জান কাকু, বাপী কিছুতেই আসতে চাইল না। চুম্‌কীর মুখে ভাত। আমাদের তো যেতে হবেই।'

ওর কথার ধরণে আমরা দুজনেই হাসলাম। 'থাক, তোমায় আর পাকা কথা বলতে হবেনা।' চীনু মেয়েকে শাসন করতে চাইল।

বুঝলাম একটা অপ্রিয় পারিবারিক প্রসঙ্গের অবতারণা হওয়ার উপক্রম হওয়ায় ও স্বস্তিবোধ করছে। আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার মানসে ওর মেয়েকে বললাম, 'স্বাতী, তুমি কোন্ ক্লাশে পড়, স্কুলের নাম কি আমায় তো জানাওনি!'

"কারমেলে পড়ি। কারমেল কোথায় তুমি জান? আমি মার সঙ্গে যাচ্ছি। কদিন স্কুলে যাবনা। তাই আমার বন্ধুদের মন খারাপ।"

স্বাতী বক্‌বক্ করতে থাকল।

'স্বাতী তুমি লক্ষী মেয়ে। এখানে বসে ছড়ার বই পড়।' বলে চীনু স্বাতীকে আমার কোল থেকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে একটা পড়ার বই হাতে দিল।

আমি হকারের কাছ থেকে ক্যাডবেরী চকোলেট কিনে স্বাতীকে দিতেই বল্ল, 'মা নেব? মার সম্মতি পেয়ে স্বাতী চকোলেট নিল।



'কতদিন এখানে আছো? আমার চাকরী জীবন এখানেই শুরু বলতে গেলে প্রায় বাইশ বছর হতে চল্ল। অথচ তোমার সঙ্গে.....।' বলেই চুপ করলাম!

'আমারও দশ বছর হতে চল্ল, মনে হয় যেন এক শতাব্দী।' ওর কথায় যেন একটা ব্যথার সুর বেজে উঠলো।

'সত্যি চীনু, কলকাতা আর দুর্গাপুরের জীবনে কত তফাৎ। ওখানে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে, আর এখানে শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাত্রা।'

'আপনার দুর্গাপুর কেমন লাগে? অবশ্য বাইশ বছর কাটিয়েছেন। এখন এ প্রশ্ন করার অর্থই হয়না।'

"ভাল লাগে-একথা বল্লে সত্যের অপলাপ হবে। তবে অনেকদিন একসঙ্গে ঘর করার ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেমন মায়ার বন্ধন গড়ে ওঠে তেমন আরকি।"

"পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব গড়ে না উঠলে মায়ার বন্ধনে সম্পর্ক কি বাধা পড়ে শানুদা?' আবার সেই ব্যথার সুরের অনুরণন শুনতে পেলাম।

'আমাদের বিয়ের বাঁধন এমনই যে, বাঁধনই পরস্পরকে টেনে আনে।' ব্যথাকে আমল না দিয়েই বল্লাম।

'বৌদি এখন কোথায়? আপনার সঙ্গে দেখছি না।' বুঝলাম চীনু ঐ প্রসঙ্গে আর বেশী দূর অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক।

'বৌদি কোথায় বলা মুস্কিল। তবে আমার জীবনে এখনও পদার্পন হয়নি এইটুকু বলতে পারি।' একটু রসিকতার সুরে বললাম।

'ওঃ, অতক্ষণ স্বামী স্ত্রীর প্রসঙ্গ পুঁথিপড়া অভিজ্ঞতা থেকে আমায় উপদেশ দিচ্ছিলেন। এবার দেখছি পদার্পণের ভার আমাকেই নিতে হবে।'

স্বাতী ইতিমধ্যে মার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বর্ধমান ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ী চলছে।

'মা ও দিদিরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। এবার তুমি হাল ধরলে একটু নতুনত্ব আসবে।'

'আচ্ছা, এতদিন বিয়ে কেন করেননি বলুনত?' 'চিরন্তন' প্রশ্ন। 'যদি বলি

বিয়ে করলে আমার পূর্ব পরিচিতার সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ আলাপ সহজ হত না বলেই আর বিয়ে করা হয়নি।'

'আহা, রসিকতা করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা চলবেনা শান্তদা। আমাকে আপনার মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, আমি মাসীমাকে আপনার বিয়ের কথা বলবো।'

'মা যদি জিজ্ঞাসা করেন হ্যাঁ বাছা, শান্তকে তুমি চিনলে কি করে? আর মা যদি ভেবে থাকেন তোমার বিয়ে আমায় বাউণ্ডুলে করেছে তখন সামলাতে পারবে তো?'

চীনু বুঝতে পারলো না আমি ঠাট্টা করে না সিরিয়াস হয়ে বলছি। চীনু চুপ করে গেল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হো হো করে হাসলাম। "তুমি আমার ঠাট্টাও বুঝতে পারনি। এত বয়স হয়েছে তোমার অথচ তুমি সেই স্টেজেই আছ দেখছি। কিছুক্ষণ আগে তোমার নাম জেনেছি। আমার বন্ধুর দোকানে তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও ছিলনা। আমরা মানে নীতু, অমলদা, হীরেন ও আমি তোমাদের ঘিরে নানা রঙ্গীন স্বপ্নের জাল বুনেছি।"

সে বয়সটাই ছিল তাই। আজকে এই ট্রেনে আমি চীনুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছি চীনুরই সৌজন্যে—এটাই বাস্তব।

"আমার রসিকতায় যদি আঘাত পেয়ে থাক তাহলে নিশর্ত ক্ষমাপ্রার্থী।"

'না, না, শান্তদা, ওটা ক্ষনিকের দুর্বলতা। তুমি কিছু মনে করোনা।'

চীনুর 'তুমি' সম্বোধনে ওর দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হতেই চীনু লজ্জারুণ হাসি হাসলো. সেই মুহূর্তেই মনে হল এই বিশ্বে চিনুই আমার একমাত্র মনের মানুষ। পর মুহূর্তেই ধাক্কা খেলাম। ছিঃ, ছি, চিনু পরস্ত্রী। আজ এই পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়সে এ দুর্বলতা সমাজ কেন আমিও ক্ষমা করতে পারবো না মনের স্বাভাবিক অবস্থায়।

'স্বাতী বলছিল, তোমরা চুমকীর মুখেভাতে যাচ্ছ। ওর কাছ থেকে চুমকীর পরিচয় নিতে পারিনি।' সহজ স্বরে চিনুকে বললাম। আমাদের সম্পর্কটাকে আলাপের প্রথম স্তরে নিয়ে আসতে চাইলাম।

'চুমকী আমার দাদার মেয়ে। আগামী কাল ওর মুখে ভাত। তুমিও এসনা শান্তদা। আমাদের বাড়ীর সবাই আনন্দিত হবে।' চিনু সহজ হয়েও সহজ হতে পারছে না।



'না চিনু; সেটা ভাল দেখাবে না। তোমাদের বাড়ীর কেউ (এক মিনু ছাড়া) আমাকে চেননা।' সেক্ষেত্রে একটা উৎসবের বাড়ীতে হাজির হওয়া শোভনীয় নয়। কিছু মনে করোনা চিনু। বরং দুর্গাপুরের ঠিকানা দাও। একদিন গিয়ে রবাহুতের মত হাজির হয়ে তোমার কর্তাকে অবাক করে দেব।' চিনু যেন সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। অনেক দূর থেকে কথা বলল মনে হল। 'দুর্গাপুরে আমাদের বাড়ীতে ত তুমি এই চিনুকে পাবেনা শান্তদা। তুমিও হয়তো এরকম সহজ সুরে কথা বলতে পারবেনা। তুমি আমায় ভুল বুঝোনা শান্তদা।' চিনু জলাভরা চোখে তাকালো!

'আজকের ট্রেনে তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপন আমার শুষ্ক জীবনে মাধুর্য্য আনতে সাহায্য করবে। চিনু এই মুহূর্তই আমাদের জীবনে সত্য হয়ে থাক।'

হাওড়া ষ্টেশনে চিনুদের বাসে তুলে দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে জনারন্যে মিশে গেলাম।

# পারমাণবিক ধ্বংসের হাত থেকে এই গ্রহকে বাঁচাতে হবে

## গ্রিগরি সেরেব্রেন্নিকভ

আগের যুদ্ধের বিভীষিকার সঙ্গে পারমাণবিক দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার কোন তুলনাই হয় না। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তা খুব ছোট। আমরা মহাকাশচারীরা, এটা ভাল করেই দেখেছি। এবং আমাদের নীল গ্রহটি যাতে নিষ্প্রাণ অগ্নি গোলকে পরিণত না হয় সেজন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর সম্মানে ভূষিত, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশচারী বৈমানিক স্বেৎলানা আভিংস্কাইয়া একথা বলেন। নিরস্ত্রীকরণ সপ্তাহ পালনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মস্কোতে যে যুদ্ধবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

মার্কিন প্রশাসন মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে প্রসারিত করতে চায়। তাছাড়া এই পরিকল্পনা খুবই মারাত্মক। স্বেৎলানা সাভিংস্কায়া একথা বলেন। মানুষ চায় শান্তিপূর্ণ মহাকাশ। মানুষ হত্যার কোন কাজে একে লাগানো উচিত নয়।

মস্কোর ক্রীড়া প্রাসাদে আয়োজিত সভায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়েছিল। তাদের কণ্ঠে ছিল "শান্তি চাই" "যুদ্ধ চাই না", শ্লোগান। "আমরা চাই পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল" শ্লোগান। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি কনস্তানতিন চেরনেনকোর কথাগুলি "সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তরিকভাবে একটা পথের কথাই বলে। তাহল শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পথ।" ইলেকট্রনিক বোর্ডে মুদ্রিত ছিল।

### যুদ্ধের বিভীষিকা

সভার অন্যান্য বক্তাদের কণ্ঠে একই সুর ধ্বনিত হল, ডাক্তার অধ্যাপক নিনা ক্রিলোভার ভাষণে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিল শ্রোতারা। তিনি বলেছিলেন, ফিল্ম দেখে বা গল্প পড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে তার জ্ঞান হয় নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদে জার্মান নাৎসীদের দ্বারা ৭৯০০ দিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার ভয়াবহ



অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। যারা সেই যুদ্ধে লড়েছিলেন, যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, যারা নিজেদের শিশু সন্তানদের কবর দিয়েছিলেন এবং আজ যারা শিশু সন্তানদের লালন পালন করছেন তাদের সকলের পক্ষ থেকে তিনি শান্তির জন্য নিরলস সংগ্রাম করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম কি হবে একজন ডাক্তার বলে আমি তা ভাল করেই জানি। হিরোসিমার কথা মনে করুন। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়াবহ পরিণাম বহু বছর পরে, এমনকি বহু দশক পরেও তাকে ভোগ করতে হয়েছে। এবং কেউ যদি ভেবে থাকে যে এথেকে রেহাই পাবে তাহলে এর চেয়ে মূর্খতা আর কিছু নেই।

অধ্যাপক ক্রিলোস বলেন যে, পৃথিবীকে বর্তমান উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য যে দেশ দায়ী সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে বোঝানো হচ্ছে যে, সীমিত পারমাণবিক যুদ্ধ সম্ভব। পর্যটন সংস্থাগুলি লোকজনকে ইওরোপ ভ্রমণে যেতে বলছে। ব্যাপারটা ভয়াবহ এবং অমানবিক। সোভিয়েত ডাক্তার একথা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি একটা জিনিসের প্রতি ক্রেতাদের মনযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, তরুণ সোভিয়েত ডাক্তাররা শপথ গ্রহণ করেছেন যে তাঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

### শান্তিরক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

শান্তির শত্রুরা অভিযোগ করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে বিপদের মুখোমুখি হয়েই তারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এসবই উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা অভিযোগ। শান্তি ও সমাজতন্ত্র একসূত্রে বাঁধা। তারা চিরকাল অবিচ্ছেদ্য ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

যারা শান্তি চায় তারা যেন প্রাণ পণে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করে—এই প্রস্তাব আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। মস্কোর যুদ্ধ বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, একটা শক্তিশালী গণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে। দেশ জুড়ে চলছে শান্তি সভা এবং শান্তি মিছিল। শ্রমিকরা যৌথ খামারের কৃষকরা এবং বুদ্ধিজীবীরা এতে অংশগ্রহণ করছেন। সপ্তাহের প্রথম তিন দিনে শুধু মস্কোতেই বহু যুদ্ধ বিরোধী সভা, সমিতি, সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষও শান্তিতে বসবাস করতে চায়, এই ছোট, কিন্তু সুন্দর গ্রহে শান্তিতে বসবাস করতে চায়।

সম্পাদকীয়

## আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল

বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে। পৃথিবী পা বাড়িয়েছে নতুনতম যুগের দিকে। এই সবুজ সুন্দর গ্রহের অধিবাসী, বৃক্ষলতা-পশু পাখী-কীটপতঙ্গ এবং সর্বোপরি মানুষ ; আমরাও উজ্জ্বলতম ভবিষ্যতের দিকে নৌকা বেয়ে চলেছি। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ধরিত্রীর বুকে একদিন গোষ্ঠী ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বেড়েছে প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব নিজের এবং পৃথিবীর প্রতি। কিন্তু সচেতনতা ও বোধ বেড়েছে কতখানি সেটা একটা মস্ত প্রশ্ন ! নিশ্চয়ই আমরা সবাই চাই শোষণমুক্ত শান্তিপূর্ণ স্বাস্থকর পরিবেশ—মানুষের ইতিহাস তো তাই প্রমাণ করে। কিন্তু মুষ্টিমেয় কুচক্রী দুষ্ট গ্রহের মত আমাদের শ্যামলী পৃথিবীকে চিরদিন রক্তাক্ত করার চেষ্টায় মেতে রয়েছে। আমরা দেখেছি বৃহত্তর মানব কল্যাণে যে ব্যক্তিত্ব ব্রতী—তাঁর উপরেই নেমে আসে ছোট-বড় শয়তানের প্রলোভন অথবা মৃত্যুবাণ। কখনো ক্রুশকাঠ, কখনো বিষপাত্র কখনো বা ঘাতকের বন্দুক গর্জে উঠে স্তব্ধ করে দিতে চায় মহৎ মানুষের হৃদপিণ্ড। বস্তুতঃ এ আঘাত ব্যক্তি বিশেষের উপরে নেমে এলেও ক্রমে আমরা সবাই তার শিকার হই। আবার ইতিহাসই বলে দেয় সন্ত্রাস কিম্বা অত্যাচার শেষ কথা নয়। শান্তিপ্রিয় সংগ্রামী জনগণ আবার রক্ত অশ্রু ঘামে ছিনিয়ে আনে ফুটন্ত সকাল ; রাত্রির বৃন্ত থেকে। হাজার বছরের ইতিহাসে কেবল এরই পুনরাবৃত্তি। এই শতাব্দীর প্রথম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু-তাই আরো সচেতন হবার জন্য নাড়া দিয়ে গেছে। শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাস্কর, গায়ক নাট্যকার এবং সাধারণমানুষের দায়িত্ব বেড়ে গেছে আরো—শান্তিরক্ষার এবং স্বদেশরক্ষার গুরু দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের। আমরা কি করব—শান্তি সংগ্রামের অতন্দ্র যোদ্ধা প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর নামে শপথ নেব এই গ্রহকে, এই দেশকে, সমস্ত মানুষকে ভালবাসব—না ত্রিশ মুদ্রার বিনিময়ে বিকিয়ে দেব নিজেদের সত্তা, দায়িত্ব এবং স্বদেশপ্রেম ?



বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম আকরগ্রন্থ

# বিশ্বকোষ

নিজের দেশকে ভালো করে জানার ও বোঝার তাগাদায় এবং সাম্প্রতিক মানুষের সমসাময়িক বৃহৎ বিশ্বের যাবতীয় জানাহরণের স্পৃহা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে পরিকল্পিত।

বোধোদয় গ্রন্থমালা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫টি গ্রন্থের লিখেছেন যশস্বী লেখকেরা। এ যাবৎ ৩৫টি প্রকাশিত। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৩ টাকা। ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ২ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

A Quarterly No. 49/82 Aug./Nov. '84 PRICE Rs. 1.

মানুষের জয় গান গায় যারা

# ক্রান্তদর্শী

তাদেরই একটি নাম

যোগাযোগ :
৭, অধরচন্দ্র দাস লেন
কলকাতা—৬৭

শতরূপা সান্যাল কর্তৃক অ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭/বি রবীন্দ্র সরণী, (শোভাবাজার মোড়) কলিকাতা-৫ হইতে মুদ্রিত এবং ৩১/২ ডঃ ধীরেন সেন সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত।